বিভক্তির সাতকাহন - ১২
ভজন সরকার

বার কয়েক টেলিফোন ইন্টারভিউ পর্ব শেষে যখন বিমানের টিকেট পাঠালো শহর দেখার জন্য,তখনই ভাবলাম বেকারত্বের হয়তো অবসান হলো এবার । ঘন্টা দু'য়েক আকাশ ভ্রমনের পর ঠিক করে রাখা ভাড়া গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম । আগে থেকেই সব কিছু জানিয়ে রাখা হয়েছে । পাক্কা তিন শ' কিলোমিটার । মুঠোফোন অধিকাংশ সময়েই কাজ করবে না । সমস্ত পথে হাতে গোনা তিনটে লোকালয় । অর্ধেকের বেশি পথ লেকের পাড় দিয়ে পাহাড়ের ঠিক গা ঘেষে । সারা পথটুকুই নাকি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যাবলীতে ভরা । কিন্তু সাবধানতা কেবল রাস্তার রাজা দৈত্যাকায় ট্রাক আর বন্য-প্রাণী থেকে ।

তখনও দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়াটুকু নামে নি । আক্ষরিক অর্থেই পাহাড়ি পথ, তীক্ষ্ণ বাঁক, ডান দিকে যত দূর চোখ যায় শুধুই টল টলে নীল জল । বামে রাস্তার ঠিক ঘাড় বরাবর উঠে গেছে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় । মাঝে মাঝে গাড়ির গতি কমানোর নির্দেশনা । চোখে পড়ন্ত রোদের তীব্রতা । শ'খানেক কিলোমিটার পর মনে হলো উঁচু পাহাড় থেকে খাঁড়া ঢাল নেমে গেছে লেকের ভেতর । লেকের ঠিক পাড় দিয়ে চলতে চলতে আবার উঠে গেছে পাহাড়ে । আবার নেমে গেছে পাহাড় বেয়ে লেকের কাছাকাছি । এভাবেই চলে গেছে ট্রানস-কানাডা হাইওয়ে- ১৭ , পূর্ব আর পশ্চিমের একমাত্র সড়ক যোগাযোগ । পৃথিবীর বৃহত্তম মিঠে -পানির হ্রদ লেক সুপিরিয়রের উত্তর পাড় দিয়ে প্রায় হাজার খানেক কিলোমিটারের এ সড়ক পথটুকু ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর আর মনোরম । পাহাড় ,জল আর গাছের এমন অত্যাশ্চর্য সম্মিলন আসলেই বিরল ।

প্রায় হাজার পাঁচেক জন বসতির ছোট্ট ছিম ছাম একটি শহর । আগ বাড়িয়ে অনেকটা লেকের পেটের ভেতর ঢুকে গেছে । দু'পাশে দু'টো পাহাড় ঠিক যেনো আগলে রেখেছে শহরটিকে । মাঝখানে ঠিক ছবিতে বসানো ছোট্ট একখানা লেক । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তৈরি করা বাড়ি-ঘর । প্রচুর গাছ-পালা আর সবুজ নিকোনো উঠোনে লাগানো অসংখ্য ফুলের বাগান । ঝা চক চকে নতুন মডেলের সব গাড়ি । শহরের আশ পাশ জুড়ে তিনটে সোনার খনি । বাসিন্দাদের বাৎসরিক গড় আয় কানাডার জাতীয় গড় আয়ের অনেক উপরে । চক চকে রাস্তা ঘাট । ইলেকট্রিক খুঁটিতে টানিয়ে রাখা রং বেরংয়ের ব্যানার আর ঝুলন্ত ফুলের টব । বেশ বিস্তৃত জায়গা জুড়ে হাজার দু'য়েক বাড়ি-ঘর । চার-পাঁচ হাজার মানুষের জন্য দু'হাজার বাড়ি প্রথমে বেশ অবাকই হয়েছিলাম । জীবনের অধিকাংশ সময় ঢাকা আর টরেন্টোর মত লোকারন্যে বাস করে আবার যেনো ফিরে পেলাম বাল্যকালের গ্রাম আর উপজেলা শহরের সহজতা ।

টেলিফোন ইন্টারভিউ পর্ব শেষে রেফারেনস চেক হয়ে গেছে আগেই । চূড়ান্ত নিয়োগের আগে আবারও কিছু প্রথাগত সাক্ষাৎকার । কতটুকু মানিয়ে নিতে পারবো এমন নির্জনতা । আর বছরের তিন-চার মাস হিমাঙ্কের নীচে নামা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের হাঁড় কাঁপানো ঠান্ডা । প্রথাগত প্রশ্নের প্রথাসম্মত তৈরী করা উত্তর । প্রায় ষাটোর্ধ এক ভদ্র মহিলা অত্যধিক বিনয় আর সর্তকতার সাথে আমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন ।

‘‘জানো , কানাডার অন্টারিও প্রদেশের এই উত্তরাংশে দু’ধরনের লোক বাস করে - যারা একে ভালবাসে আর যারা ঘৃনা করে ’’ ।

‘‘ মনে হয় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই দু’ধরনের লোকের বাস - যারা ভালবাসে আর যারা ঘৃনা ছড়ায় । ’’ আমার দার্শনিক সংযোজনে ভদ্রমহিলার চোখে মুখে একটা আপ্লুত সম্মতির আলোকচ্ছটা খেলে গেলো ।

আমাকে আরও জানালো যে , আরেকজনকে ডাকা হয়েছিলো চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য এবং ঘটনাক্রমে সেও বাংলাদেশের । আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ধন্যবাদ দিলাম ভদ্রমহিলাকে এজন্য যে, আমি না হোক অন্তত আমার দেশের কেউ এ চাকুরিটা পাচ্ছে । ভদ্রমহিলা আবারও মুচকি হাসলেন । আমি তখনই নিশ্চিত হলাম চাকুরিটা আমি-ই পাচ্ছি ।

দিন দু’য়েকের মধ্যেই চূড়ান্ত নিয়োগ পেয়ে টরেন্টো ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি । হঠাৎ একটা টেলিফোন । বাংলাদেশের সেই প্রতিযোগী-প্রার্থী আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন । কিন্তু সাথে এটা বলতেও ভুললেন না যে, তিনি যাচ্ছেন না বলেই আমি চাকুরিটা পেলাম ।
আমি সহসাই জিজ্ঞাসা করে বসলাম ,‘‘ আপনি কেনো যাচ্ছেন না? চাকুরিটা কি আপনার হয়েছিলো?’’
‘‘ না, আমি বেতন বেশী চেয়েছিলাম তো, তা ছাড়া——’’ ভদ্রলোক আমতা আমতা করে আর কথা বাড়ালেন না । অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অপ্রস্তুত উত্তর । অধিকাংশ প্রবাসী বাঙ্গালীর এ ধরনের হীনমন্যতার সাথে পরিচিত অনেক দিন থেকেই । তাই টেলিফোন রেখে দিলাম ।

আবার বাধা-সাধার প্রস্তুতি, আবারও পরিবর্তন । এবার শুধু বাসা বদল নয় ,পাকাপাকি ভাবে চলে যাওয়া । কোন টা ফেলবো আর কোনটা রাখবো ? রাখা আর ছুঁড়ে ফেলার এ মহা হিসেব -নিকেশ । যত বার এ মহাযন্ত্রণায় পরেছি , আত্মার দেহ বদলের সেই বহু-চর্চ্চিত কথা মনে হয়েছে বার বার । নতুন বাসা- নতুন আসবাবের সাথে মানুষও কি বদলে যায় একটুকু হলেও ? আসলেই কি বদলায়? বদলে গেলেও কি ভাবে বদলায়, কতটুকু ? ভাল খারাপ হয় , নাকি খারাপ ভাল ? না, সারাজীবন থেকে যায় যা ছিলো তাই ? (চলবে)

।। আগ ষ্ট, ২০০৬, কানাডা ।।